একক ২ ❑ কৌতুকহাস্য ঃ কৌতুকহাস্যের মাত্রা ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটির পরিচয়

২.৩ 'পঞ্চভূত' : রচনারীতি

২.৪ প্রবন্ধদুটির নিবিড়পাঠ

২.৪.১ 'কৌতুকহাস্য'

২.৪.২ 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'

২.৫ 'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'-র বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ

২.১ ❑ প্রস্তাবনা

সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে একজন আলোচক যেমন একটি সাহিত্যকর্মকে সংজ্ঞায় বাঁধতে চেষ্টা করেন তেমনি একজন লেখক তাঁর রচনাকর্মকে সংজ্ঞার সীমানা-অতিক্রমী বৈশিষ্ট্য প্রদান করতে সচেষ্ট হন। একথা ঠিক, একজন লেখক সংজ্ঞা মিলিয়ে কখনওই কোনও সাহিত্য রচনাতে ব্রতী হন না। ফলে তাঁর রচনাটি সংজ্ঞা-নির্ধারিত হয়ে উঠেছে কি না, বা কেমন লিখলে তা সংজ্ঞা-নির্ধারত হবে সে-সম্পর্কে লেখকের কোনও সচেতন প্রয়াস থাকে তাও বলা যায় না। সাহিত্য বা শিল্প রচনার মধ্যে থাকে 'হয়ে-ওঠা'। তবে একজন বড় লেখকের লেখায় এমন কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকে যা তাঁর রচনা-বৈশিষ্ট্যকে জানান দেয়, তা সব সময় প্রচলিত সংজ্ঞার সীমানা-অতিক্রমী লেখা নাও হতে পারে। রচনাকর্মের প্রচলিত সংজ্ঞার সীমানা-অতিক্রমী প্রদানের কাজটি আসলে সহজ নয়। কিন্তু তবুও কোনও কোনও রচনার মধ্যে থাকে সেই অভিজ্ঞান; 'পঞ্চভূত' এরকমই একটি গ্রন্থ।

'পঞ্চভূত' গ্রন্থটিকে আমরা প্রচলিত সংজ্ঞায় প্রবন্ধ-গ্রন্থ বলে চিহ্নিত করলেও তাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রচলিত প্রবন্ধের সঙ্গে মেলে না। এজাতীয় গ্রন্থগুলির আস্বাদনের যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই এর আলোচনাও রচনাকর্মের অনন্যতার কারণে একটু ভিন্ন পথ অনুসরণ করে।

২.২ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটির পরিচয়

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা ১৩০৪ সালে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। 'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' রচনাদুটি গ্রন্থটির অন্তর্গত। 'সাধনা' পত্রের তৃতীয় বর্ষের ১৩০১-এর পৌষ সংখ্যায় প্রথমটি এবং ১৩০১-এর ফাল্গুন সংখ্যায় দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থের অন্যান্য রচনাগুলিও——'পরিচয়', 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ', 'নরনারী', 'পল্লিগ্রামে', 'মনুষ্য', 'মন', 'অখণ্ডতা', 'গদ্য ও পদ্য', 'কাব্যের তাৎপর্য', 'প্রাঞ্জলতা', 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ', 'ভদ্রতার আদর্শ', 'অপূর্ব রামায়ণ', 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল', সাধনা'র ১৩০০—১৩০১-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে কোন কোন রচনার শিরোনামে ছিল 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় স্বীয় রচনার সংস্করণে নিরত থাকতেন পরিমার্জনা-পরিবর্জন-সংযোজনা নিয়ে, এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৩১৪-এর বৈশাখে প্রকাশিত 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়েছিল রচনাগুলি। যদিও সাধারণ্যে পরিচিত থেকেই গিয়েছিল 'পঞ্চভূত' নামেই।

ডায়েরির সংজ্ঞা ও পঞ্চভূত :

ডায়ারি বা Diary কথাটি সদ্যতন বাংলা হয়ে উঠলেও কথাটি বিশুদ্ধ ইংরেজি। এসেছে ল্যাটিন Dies শব্দ থেকে ইংরেজি Day ইংরেজিতে অর্থ করলে বলতে হয় a daily record, আরও ছড়িয়ে করলে বলতে হয় a book for noting daily engagement, duties, etc, বাংলায় বলা যায় দিনপঞ্জি বা রোজনামচা। ডায়ারি রচনা করা হয় একেবারে নিজের জন্যে। যার ভাষা অনেক সময় হয় ডট ডট কন্টকিত, সাংকেতিক। ভবিষ্যতের নিজস্ব কাজকর্মের প্রস্তুতিতে বা ব্যবহারিক জীবন থেকে পাওয়া নানা দুঃখবেদনা প্রত্যাশা-ভঙ্গের কষ্টকে দেগে রাখতে বা আনন্দঘন বিস্ময় ও নিবিড় অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে পরবর্তী জীবনের লেখালেখির উজ্জীবন ঘটাতেও এই ধরনের দিনলিপি রচনা করে যান লেখকেরা—বাংলা সাহিত্যের বড়ো লেখকেরা ডায়ারি রচনা করে গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে জীবনানন্দ দাশের ডায়ারি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়ারি, সতীনাথ ভাদুড়ীর ডায়ারি, সবার ঊর্দ্ধে তো আছেই বিভূতিভূষণের একাধিক ডায়ারি। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও দুই গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে, যা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী।' ডায়ারি সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনার এক ধরনের নিষ্পত্তি ঘটে যায় 'পঞ্চভূত অন্তর্গত 'পরিচয়' প্রবন্ধটির সূত্রে। আলোচনার পরিসরটিকে জিইয়ে রেখেও তিনি স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন কাকে তিনি 'ডায়ারি' জাতীয় রচনা বলেন, কাকে বলেন না। আধুনিক কালের যে কোন কবি-লেখক-প্রাবন্ধিক অল্পবিস্তর সাহিত্যের প্রকরণগুলি জানেন, এবং লেখালিখিতে রত হন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এ বিষয়ে প্রথম শ্রেণির থিয়োরিস্ট বা তত্ত্ববিদ্।

ডায়ারি' সম্পর্কে তাঁর প্রথম কথা, ডায়ারিকে সাহিত্যের রসাস্বাদের বিষয়বস্তু করা যায় না। ডায়ারির অন্তর্গত জীবন এবং যাপিত-জীবনের সেই-সব দিনলিপি একে অন্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। দুয়ের মধ্যে থাকে স্পষ্ট বিরোধ। তাঁর ভাষায় 'জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মখণ্ডন অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্বপরের অসামঞ্জস্য থাকে।' অর্থাৎ বিশুদ্ধ ডায়ারি, যদি অর্থবোধে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না, তবে সে হয় বস্তুগত। একেবারে নিখাদ খনিজ। অন্যদিকে ডায়ারিকে যদি প্রকাশযোগ্য করতে হয়, তবে তাকে একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করতে হয়, যাতে বিরোধের মীমাংসা ঘটবে, অসামঞ্জস্য দূরীকৃত হয়ে একটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, যা প্রকারান্তরে দার্শনিক প্রতীতি থেকে জীবনবাণীর বাহক হবে। সমসাময়িক সময়ে লেখা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী' গ্রন্থের ভূমিকায় সুহৃদয় শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে এই মনোভাবের কথাটিই আর এক ভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল য়ুরোপীয় সভ্যতার ঠিক মাঝখানটাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে একবার তার আঘাত আবর্ত এবং উন্মাদনা, তার উত্তাল তরঙ্গের নৃত্য এবং কলগীতি, অট্টহাস্য করতালি এবং ফেনোচ্ছ্বাস, তার বিদ্যুৎবেগ, অনিদ্র উদ্যম এবং প্রবল প্রবাহ সমস্ত শিরা স্নায়ু ধমনীর মধ্যে অনুভব করে আসব।' অর্থাৎ তাঁর দিনযাপনের কালপঞ্জিকা হয়ে উঠবে সময়ের মন্থনক্রিয়া, একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠবে সময়ে নির্গলিত প্রবাহটিকে পরিবেষন করা। যে কারণে তিনি ডায়ারি-ধর্মী রচনা কম লেখেননি—— 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', 'জাপানযাত্রী', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', 'জাভা-যাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পারস্যে', 'পথে ও প্রান্তে', কোথাও তিনি সেভাবে স্থান-দিন-তারিখকে গুরুত্ব দেননি, কোথাও কোথাও সবিস্তারে বলেছেন বটে কিন্তু তা করেছেন গ্রাহকজনের কাছে নিজের জীবন-বানীর প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতেই, জীবনের কূটিল আবর্তনের গতি-প্রকৃতিকে চিনে-বুঝে আমাদের মগজ-মেধার চলিষ্ণুতায় সময়ের সংযোগ ঘটাতেই।

পঞ্চভূত রচনার অন্তর্গূঢ় কারণ :

সবকিছুই 'নিয়মের ফল'—— অবশ্যই যে কোন ধরনের রচনাও। 'পঞ্চভূত'এর ষোলটি প্রবন্ধ নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে দেখা যাবে এর পাঁচটি চরিত্র ক্ষিতি, স্রোতস্বিনী, দীপ্তি, সমীর ও ব্যোম তাদের

মধ্যে নিরন্তর তর্কাতর্কি করে চলেছে 'সত্য' এর উদঘাটনে। যে-সত্য অবশ্যই ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয়, ব্যক্তি সাপেক্ষ। অর্থাৎ ক্ষিতির কাছে যা পরম সত্য, তা ব্যোমের কাছে গ্রহণীয় নয়—— দীপ্তি স্রোতাস্বিনী সমীরের কাছে সেই সত্য গ্রহণেও নানা বাধা আছে, গ্রহণবর্জনের প্রাসঙ্গিকতা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের প্রতি দায়বদ্ধ—— 'ধর্মশপথ' নিয়েছে সভ্যতার অভিমুখকে তর্কাতর্কির মধ্যে দিয়ে 'নিষ্কাশিত অমিলতার মতো' শাণিত-সুন্দর করবার জন্যে, মনুষ্যত্বের অর্জনকে ফলপ্রসূ করে তোলবার জন্যে আমাদের জীবনযাপনের সর্বাঙ্গীন প্রক্রিয়া থেকে 'অনাবশ্যককে পরিহার' করে 'আবশ্যকের সঞ্চয়'কে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করবার জন্যে প্রয়াসী থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মানুষের সহিত জড়ের সম্বন্ধ লইয়াই সংসার নহে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধটাই আসল সংসারের সম্বন্ধ। কাজেই বস্তুবিজ্ঞান যতই বেশি শেখ-না কেন, তাহাতে করিয়া লোকব্যবহার-শিক্ষার কোনো সাহায্য করে না। কিন্তু সেগুলি জীবনের অলংকার, যাহা কমনীয়তা, যাহা কাব্য, সেইগুলিই মানুষের মধ্যে যথার্থ বন্ধন স্থাপন করে, পরস্পরের পথের কন্টক দূর করে, পরস্পরের হৃদয়ের ক্ষত আরোগ্য করে, নয়নের দৃষ্টি খুলিয়া দেয় এবং জীবনের প্রসার মর্ত হইতে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তারিত করে।' ('পরিচয়'—'পঞ্চভূত') কিন্তু তাঁর অন্বেষায় ছিল একালের বিজ্ঞাপন-বিপণনের সেই 'Complete Man' । 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' এর বহুবিধ নজির, বাংলা সমাজজীবনের পরিশ্রমী বিশ্লেষণ, বিশেষজ্ঞদের অভিমত সে-রকমই কথা বলে।

বাংলার তথাকথিত 'নবযুগ' বা 'রেনেসাঁস' এর চরিত্র নিয়ে তর্কাতর্কি বহুদিনের—— কাদের 'নবযুগ' বা 'জাগরণমঞ্চ' হয়ে উঠেছিল, তার সীমা-পরিসীমা কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল এ-সব কথা তো আছেই, সাম্প্রতিককালের ধৃতিকান্ত লাহিড়ি চৌধুরীর মতো বিদ্বজনেরাও যখন প্রশ্ন তোলেন, তথা মধ্যবিত্ত সমাজ তো দূর অস্ত, সেটা কী আদৌ সুতানুটির ভূগোল অতিক্রম করতে পেরেছিল? (২৮শে মে ২০০৫, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা)

উদ্যত প্রশ্নটি অধিকতর গুরুত্ব পেত যদি-না ১৩১৫ সালে মৈমনসিংহ থেকে প্রকাশিত কেদারনাথ মজুমদারের গবেষণা সমৃদ্ধ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, গ্রন্থটি দিলীপ মজুমদারের সুসম্পাদনায় সাম্প্রতিক সময়ে পুনর্মুদ্রিত হত। এই গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়ে কেদারনাথ ১৮১৭-১৮ থেকে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিশতাধিক সাময়িক পত্র-পত্রিকার একটি তালিকা দাখিল করেছেন। তালিকাটি অসম্পূর্ণ হলেও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দেরি হয় না— সুতানুটির ক্ষুদ্র পরিসর থেকেই শুধু নয়, কলকাতা ও কলকাতাকেন্দ্রিক মফস্বল থেকে শুরু করে বর্ধমান, শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর হালিশহর, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, জয়নগর, ঢাকা, বরিশাল, আসাম, উৎকল থেকেও প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও ঠিকই পত্র-পত্রিকাগুলির গ্রাহক সংখ্যা ছিল অতিস্বল্পই। যেমন 'জ্ঞানান্বেষণ' এর মতো পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ছিল কুল্যে ৪৯ জন, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মতো জনসমাজে আলোড়ন পত্রিকাও কখন গ্রাহক ৭০০'বেশি পায়নি। তা সত্ত্বেও 'সুতানুটি কেন্দ্রিক জাগরণ' এর তথ্যটি খারিজ হয়ে যায়। নির্দ্বিধায় বলা যায় মেধা-মননের চর্চা নিয়ে চলমান জগৎ ও সভ্যতার আলোক পুট বা মজলিশ-সম্মিলনীর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল। নিখাদ তথ্য থেকেই জানা যায় সেকালের অনেক ধনকুবেররাই তাদের মজলিশ-মস্তির কেন্দ্রস্থল বাগানবাড়িতে এক-একটি নির্দিষ্ট দিনে সাহিত্য সম্মিলনীর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন। যেমন ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বাগানবাড়িতে 'সাহিত্য সমালোচনা সঙ্গ', নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেখান থেকে আলাপ-আলোচনা তর্কাতর্কির ভিত্তিতে দ্বিভাষিক পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রকাশিত হত। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে দর্জিটোলার নরনারায়ণ দত্তের বৃহৎ বাড়িতে 'বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনী সভা' নামের একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, যে-আসর থেকেই হাত মশ্‌কো করে বেরিয়ে আসেন সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা অক্ষয়কুমার দত্ত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভা তো হট্টগোলে কবিওয়ালাদের আসরে আসরে অপচয়িত হয়েই যেত যদি-না পাথুরিঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদার অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা না-পেত। সংখ্যাগত পরিসংখ্যানের বিচার থেকে নয় সে-সব দিনের ঊণতা-ন্যূনতাকে পরিবর্তনের

গুণগত দিক থেকেই দেখতে হবে। কয়েক বছরের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অক্ষয়কুমার দত্তের যৌথ নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙালির মননচর্চা ও সৃষ্টিশীলতার পরিমণ্ডলে যা এক যুগান্তরের সূচনা করে দেয়। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার যখন সূচনা হয় তখনও রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়নি। তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ কখন লেখালেখিও করেননি। কিন্তু তাঁর মানসিকতা গঠনে সমাজমনস্ক বৌদ্ধিক সত্তা গঠনে এই পত্রিকা মূল বনেদটাই যেন গঠন করে যায়। শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী থেকে শুরু করে নীহাররঞ্জন অবধি কৃতবিদ্যেরা যথার্থই উল্লেখ করেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে সারাজীবন ধ্রুবতারার মতো আলো দেখিয়ে চলেছে. এখন সময় এসেছে পিতৃদত্ত সেই-আলোকের স্বরূপটিকে সম্যকরূপ বুঝে নেওয়ার, এবং সেই বুঝে নেওয়ার কাজে প্রবৃত্ত হতে হলে ঘুরে ফিরে আসবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমারের যুগ্ম নেতৃত্বের কথা। তৎকালীন সারস্বতমণ্ডল তথা জ্ঞানানুশীলন তথা শিক্ষানবিশ পাঠক-লেখকদের একটা অয়স্কান্ত-মডেলই যেন তুলে ধরেছিল এই পত্রিকা। সূত্রাকারে বললে বলতে হয়,

(১) প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জ্ঞানের তথ্যবহুল প্রত্যয়নিষ্ঠ আলোচনার মহতী পরিমণ্ডল গড়ে তোলাই ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্বপ্রধান প্রয়াস। যে কারণে জমিয়ে তুলেছিল বিতর্ক-বিজল্পের সঙ্গে নিবিড় আত্মচিন্তার পরিসর।

(২) ভালো লেখা লেখাতেই হবে। লিখতেই হবে। সেখানে কোন সুপারিশ বা পক্ষপাতিত্ব চলবে না। যে উদ্দেশ্য গঠিত হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রবন্ধ নির্বাচন সমিতি'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখকে নিয়ে যে কমিটির সদস্য ছিলেন আটজন। কম করে চারজনে ঐকমত্যে না-পৌঁছলে কোন লেখা মুদ্রিত করা যাবে না। প্রত্যেক পাণ্ডুলিপিতে নির্বাচক সমিতির সভ্যদের মন্তব্য সহ দস্তখত থাকতে হবে।

(৩) ব্যক্তির স্ফুরণ বা ব্যক্তির প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে নয়, সামাজিক প্রয়োজনে নিয়োজিত করতে হবে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে যে-নজির সৃষ্টি করেছিলেন তা অনন্য। নিখাদ তথ্য থেকে জানা যায়, ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'জগবন্ধু' পত্রিকায় 'বেদ ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র নহে' এই নামে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের বিরোধিতা করে মালিক-দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তকে একটি লেখা লিখতে বলেছিলেন, কিন্তু সে-লেখা অক্ষয়কুমার অস্বীকার করেন, কারণ তাঁর মত ছিল 'বেদ পৌরুষেয়'। অতঃপর সেই প্রবন্ধ লেখেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথই—— অক্ষয়কুমার মতাদর্শের সেই লড়াই থেকে সরে না-গিয়ে ব্রাহ্মসমাজের ব্যস্ত পরিসরে নিয়ে যান—— সমুজ্জ্বল বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সদস্যের মতকেও নিজের অনুকূলে টেনে আনেন—— দেবেন্দ্রনাথ অভিনিবিষ্ট নম্রতায় সে-মতের বিরোধিতা আর করেন না। মতান্বেষনী উদারতা ও চরিত্রের বলবত্তার এ এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। বাস্তবে তো দুজনের সম্পর্ক ছিল এক ধরনের শালিক-কর্মচারীরই। অক্ষয়কুমার দত্ত নিয়োজিত হয়েছিলেন ত্রিশ টাকা বেতনে, অবশেষে সেই বেতনই বাড়তে বাড়তে পৌঁছেছিল ষাট টাকায়, দুজনের মধ্যেকার মৌলিক বিরোধ কিন্তু এতটুকুও মন্দীভূত হয়নি। এ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের সেই-স্বীকারোক্তিটি তো নিশ্চয় প্রত্যেকেরই জানা আছে, 'আমি কোথায় আর তিনি কোথায়? আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশপাতাল প্রভেদ। ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি।'

প্রকৃতপক্ষে লেখক তৈরির সঙ্গে পাঠক তৈরির কাজও শুরু করে দিয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে-কারণে বিতর্ক-বিজল্পের ক্ষেত্রটিকে কর্ষিত রেখেছিলো। কোন গ্রাণ্ড ডিসকোর্স বা 'মহৎবাচন' তৈরি করে চিন্তাধারাকে প্রণালীবদ্ধ করতে চায়নি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধ পূর্ণতার পথে চলেছিল পিতৃদত্ত এই তিন গুণের সঞ্চালন

নিয়েই। প্রথমত নিবিষ্ট আত্মচিন্তার মধ্যে দিয়ে স্বরূপের ব্যাখ্যান বুঝে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, ক্রমাগত সমন্বয় ও সংশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে অভিমুখ রচনা করে নিতে হবে, চেতনা-চিন্তার সম্যক ঋদ্ধি ও স্ফূরণের জন্যে দরকার ব্যাপক আত্মীয়করণ—— যাকে কোন ভাবেই অগ্রাহ্য করলে চলবে না, পৃথিবীর গঠনে সভ্যতার নির্মাণে, সত্তার সম্পন্নতায় একরৈখিকতার একশৈলিকতার কোন স্থান নেই। তৃতীয়ত পরমত বা ভিন্নমতকে সশ্রদ্ধায়, পরম মান্যতায় বিবেচনায় স্থান দেওয়া, যার আধুনিক নাম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, যা কিনা ভারতীয় জীবনধারারই প্রকৃষ্ট পরিচয়—— উল্লেখন নিয়ে প্রভাতকুমারের মতো মনীষী লেখকেরাও রবীন্দ্রনাথের জীবনে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিদাদার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে মন্তব্য জুড়েছেন 'আমূল পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দেওয়া' এই দুই-জ্যেষ্ঠের তথাকথিত নব্যপন্থার প্রতি প্রবল এক আকর্ষণবোধই রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবনের দিগন্ত রেখা রচনা করে দিয়েছিল—— এ মন্তব্যে অতিশয়োক্তি আছে, দুই দাদার দ্বারা প্রবল ভাবে আকর্ষিত হলেও, পূর্বোক্ত সমন্বয়-সংশ্লেষণের পথ ধরেই জীবনের ছন্দিত রূপায়ণে আগ্রহী হয়ে চলেছিলেন। অথচ সেই কালবেলায় জীবনের নানাদিকের অনুশীলন-চর্চায় দেখেছিলেন অস্মিতাসর্বস্বতারই উন্মত্ত-উদ্দামতা। রাজনীতি তথা লোকমুক্তির ক্ষেত্রেও দেখেছিলেন সেই-উচ্চণ্ডতারই ফলিত প্রকাশ।

যে কারণে সেই সব দিনে সতত চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। ভারতীয় জীবনধারা তথা বঙ্গীয় জীবনধারা এ কোন দিকে চলবার জন্যে পাল তুলে দিয়েছে? অন্তরের গভীর সৌন্দর্যবোধ ও নিষ্কলুষ সমাজসচেতনতা থেকে সরে থেকে উচ্চনিনাদী পরমত অসহিষ্ণু অনিয়ন্ত্রিত অসুন্দর জীবনযাপন করা কী সম্ভব? যে ব্যথা রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের অনেক পত্রেই গুঞ্জরিত হয়েছে। ছিন্নপত্রে' শহরের চেনা-ছকের বাইরে এসে দেশ দেখার একটা আনন্দ ব্যক্ত হয়েছে ঠিকই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ তো ভাগ করে নেওয়ার সামগ্রী। দরকার প্রাণের সঙ্গী। যে-প্রাণ সহমত কথায় কথায় পোষণ না করলেও উদাত্ততার সঙ্গে ধৈর্যের সঙ্গে প্রেমের সঙ্গে নিজেকে নিরাভরণ ভাবে তুলে ধরে বা ধরবে। বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে চিঠি লেখেন, দিনপঞ্জি রচনার মতো করেই ইন্দিরা দেবীকে চিঠি লেখেন কিন্তু সঙ্গাহীনতার বেদনা কী যায়। গল্প লেখার মালমশলা যত্রতত্র বটে, 'হিতবাদী' 'সাধনা' ইত্যাদি সাময়িকীর জন্যে লেখালেখির চাহিদাও আছে ঘনঘন তাগিদাও আছে কিন্তু তাতে প্রাণের তুষ্টি কী হয়? প্রাণের তুষ্টিসাধনে দরকার সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষজন। যাদের সঙ্গে নিরন্তর আলোচনা হবে, প্রবল তর্কাতর্কি হবে 'দেশের প্রতি ভালোবাসা' ও 'সমাজহিতৈষতার আদর্শ নিয়ে' 'মানব অস্তিত্বের বর্ণময় সমাহৃতি নিয়ে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই অক্টোবর লোকেন পালিতের রাজশাহিতে জেলা-জজ হয়ে আসায় সে ধরনেরই এক আবেষ্টনী রচিত হয়ে যায়। রাজশাহি-নাটোরে তখন কিছু জ্ঞানী-গুণীদের বাসস্থল হয়ে উঠেছিল—— নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় তো ছিলেনই—— ছিলেন স্থানীয় আইনজীবী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, কলকাতা থেকে প্রায়শই বায়ু পরিবর্তনে এসে থেকে যেন প্রমথ চৌধুরীও—— তর্কাতর্কির শুদ্ধ মজলিশ জমে উঠতে থাকে। কখনও আসর জমে উঠতে থাকে লোকেন পালিতের বাংলায়, কখনও বা নাটোরের মহারাজার হাভেলিতে। পঞ্চভূত-এর আইডিয়া গড়ে উঠতে থাকে। এখন রবীন্দ্রনাথের যত কথা বলার আছে, ততই কথা শোনারও আছে। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী আলাপচারিতায় জানিয়েছেন পঞ্চভূতের 'জ্যান্ত ভূত'গুলির কথা—— একজন নাকি ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, অন্যজন মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। বাকি তিনজনের মধ্যে তো থেকে যায় তিনটি নামই—— লোকেন পালিত, শরৎকুমার রায় এবং স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী মহাশয়।

এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য পাওয়া যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের এক জায়গায়ঃ

"সত্যেন্দ্রনাথের (ঠাকুর) বাড়িতে জমে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সাহিত্যিকদের মজলিস। 'পারিবারিক স্মৃতি' নামে

এক খাতায় সাহিত্যিকরা লেখেন নানা বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মত ও মন্তব্য। একই বিষয়ে বহুজনের বহুমত হইতে পারে—পক্ষে ও বিপক্ষে; বিপরীত মত পোষণেও আপত্তি নাই, অদ্ভুত ঘটনাও লিপিবদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই লেখকদের মধ্যে প্রধান—তাঁহার হাতে কোনো সাময়িক পত্রিকা নাই। নানা কথা নানা ভাবে মনে জাগে, এই খাতায় লিখিয়া যান আপনমনে; কেহ বা তার মধ্যে খুঁত ধরে, টিপ্পনী করে—তাহাতে বাদ-প্রতিবাদ হয়, লেখার উজ্জ্বল্য রাড়ে। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আছেন জ্যেষ্ঠদের মধ্যে; তা ছাড়া আসেন আশুতোষ চৌধুরী, তাঁহার ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র, কবি অক্ষয় চৌধুরী, সিভিলিয়ান লোকেন পালিত; ছোটদের মধ্যে আছেন সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ। এই পাণ্ডুলিপিখানি ভালো করিয়া পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা মুখ্যত এই পাণ্ডুলিপির উপাদান ও আইডিয়া হইতে গৃহীত।"

২.৩ পঞ্চভূত : রচনারীতি

'পঞ্চভূত' গ্রন্থটি এক অভিনবরীতিতে উপস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কথোপকথন আশ্রয়ী রচনা এটি। লেখক ছটি চরিত্রের পরিকল্পনা করে, সেই ছটি চরিত্রের একটি নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনাকে আশ্রয় করে প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছে। তবে প্রবন্ধগুলি আবার কেবল ছটি চরিত্রের আলোচনার ধারাবিবরণী নয়। লেখকের পরিকল্পিত ছটি চরিত্রের মধ্যে পাঁচটি চরিত্র যে সকল তর্ক-বিতর্ক চালায় এবং অন্য চরিত্রটি এ আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ককে যে মীমাংসা বা সিদ্ধান্তের জায়গায় পৌঁছে দিতে চায় তা সরাসরি উপস্থাপিত হয়নি প্রবন্ধগুলিতে। একেকটি প্রবন্ধের মধ্যে উত্থাপিত আলোচ্য বিষয় ধরা পড়েছে ডায়েরিকে আশ্রয় করে। ভূত-সভার সভাপতি ভূতনাথবাবু তাঁর ডায়েরিতে উত্তমপুরুষের জবানিতে আলোচনাসভাটি যে-ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তা-ই হয়ে উঠেছে একেকটি প্রবন্ধ। ফলে 'পঞ্চভূত'-এর প্রত্যেকটি প্রবন্ধ যেন আলোচনাসভার আলোচ্য বিষয়বস্তুর বি-নির্মাণ।

বক্তব্যটি আরও একটু স্পষ্ট করা যাক। এ-জন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। গ্রন্থটির প্রথম প্রবন্ধ 'পরিচয়' ও ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। এই প্রবন্ধটিতে ডায়েরি সম্পর্কে কিছু অভিমত প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে। এর মধ্যে প্রবন্ধের 'আমি' অর্থাৎ ভূতনাথবাবুর বক্তব্য অনুসরণ করা যেতে পারে। ভূতনাথবাবু জানিয়েছেন—

(১) "ডায়েরি একটি কৃত্রিম জীবন। কিন্তু যখনই উহাকে রচিত করিয়া তোলা যায়, তখনই ও আমাদের প্রকৃত জীবনের উপর কিয়ৎ পরিমাণে আধিপত্য না করিয়া ছাড়ে না। একটা মানুষের মধ্যেই সহস্রভাগ আছে, সবকটাকে সামলাইয়া সংসার চালানো এক বিষম আপদ, আবার বাহির হইতে স্বহস্তে তাহার একটি কৃত্রিম জুড়ি বানাইয়া দেওয়া আপদ বৃদ্ধি করা মাত্র।" (পঞ্চভূত, 'পরিচয়')

(২) "আমি নিজেকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিতে চাহি না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহাকে ভাঙিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।" (ঐ)

দুটি উদ্ধৃতিই ডায়েরি সংক্রান্ত, আর প্রতিটি প্রবন্ধই (আলোচ্য গ্রন্থের) ডায়েরির অনুলিপি; শুধু তাই নয়, ডায়েরিসংক্রান্ত অভিমত যে প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে সেটিই 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধের প্রথম প্রবন্ধ। ফলে সব মিলিয়ে ডায়েরি সংক্রান্ত এই অভিমতগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। ডায়েরি লেখার কাজের মধ্যে আছে জোড়-মেলানো। সেখানে সমস্ত বিরোধ, বৈপরীত্যের মীমাংসা প্রদানের প্রচেষ্টা থাকে। যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর তাগিদ থাকে। ফলে ডায়েরিতে উঠে আসা বিচিত্র ভাবনা একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে ধাবিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন 'পঞ্চভূত'-এর একেকটি প্রবন্ধকে ভূতনাথবাবুর লিখিত ডায়েরি বলতে চান তখন একদিক দিয়ে তা প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গেঁথে যেভাবে একটি জীবন গড়ে উঠেছে তার ওপর 'দ্বিতীয় জীবন' খাড়া করা।

এর ফলে প্রবন্ধগুলি ভূতসভার সঠিক অর্থে ধারাবিবরণী থাকে না, হয়ে ওঠে ভূতনাথবাবুর ভূতসভা সম্পর্কিত অভিমতের অনুলিপি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য তা নয়। নয় বলেই ভূতনাথ জানান—"এমন কথা লিখিব যাহা আমাদের সকলের। এই আমরা যে-সব কথা প্রতিদিন আলোচনা করি—"। অবশ্য ভূতনাথ জানিয়ে দেন সে ডায়েরি সত্যের অনুরোধে লেখা হবে না, 'আমি তোমাদের মুখে কথা বানাইয়া দিব।' মুখে কথা বানিয়ে দেবার অধিকার থাকাতে ভূতনাথবাবুর নিজস্য অভিমত প্রকাশের সুযোগ বেশি পান সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে মনে রাখতে হয়, এখানে কল্পনা করা হয়েছে আরও পাঁচটি চরিত্র, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের স্বতন্ত্র স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কথা জানিয়েছেন, ফলে তাঁদের মুখের কথাকে সেই চরিত্রের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হতে হয়।

অর্থাৎ ডায়েরির মধ্যে যে ব্যক্তিগত স্বরের প্রাধান্য তাকে যেমন প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন লেখক, আবার প্রয়োজনে তার সীমানাকে ভাঙছেনও। প্রতিটি প্রবন্ধই ভূতনাথবাবুর ডায়েরির অনুলিপি—এই ভাবনার মধ্যে আছে ব্যক্তিগত স্বরের প্রাধান্য। কিন্তু প্রতিটি প্রবন্ধই একটি নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক। বিষয় যেখানে নির্দিষ্ট হয়ে যায় সেখানে তা একান্ত ব্যক্তিগত থাকতে পারে না, বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার প্রবণতা এখানে জাগ্রত হয়। আবার সেই বিষয় সম্পর্কে কেবল ভূতনাথবাবুর অভিমত প্রকাশের সুযোগ নেই, আছে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অভিমত প্রকাশের অবকাশ। ফলে প্রবন্ধের বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন মাত্রা সংযুক্ত হয়, উঠে আসে বহুস্বর। আবার এই বহুস্বরকে যেভাবে ভূতনাথবাবু সজ্জিত করেন, যার ফলে একটি সিদ্ধান্তের অভিমুখে প্রবন্ধটি ধাবিত হয় বা পৌঁছয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভূতনাথবাবুর জবানিতেই তা শেষ হয়। তাতে ভাবনার বৈপরীত্য, অসামঞ্জস্যগুলি প্রবন্ধটির পর্বে পর্বে যেমন চেনা যায়, তেমনি ঐক্যের তানটিও ধরে নিতে পারি। প্রবন্ধের চেনা-আদল এইভাবেই অতিক্রম করে যায় 'পঞ্চভূত'।

২.৪ প্রবন্ধ দুটির নিবিড় পাঠ

২.৪.১ কৌতুক হাস্য

এক শীতের সকালে উপভোগ্য সমীর, ক্ষিতি আর ব্যোম—ভূত-সভার তিন পুরুষ সদস্য তখন সবেমাত্র একত্রিত হয়েছেন। সমীর চাপানে রত, ক্ষিতি খবরের কাগজ পাঠে নিবিষ্ট, আর ব্যোম এক উজ্জ্বল নীল-সবুজ মিশ্রিত গলবন্ধ মাথায় জড়িয়ে, হাতে একটা অস্বাভাবিক মোটা লাঠি হাতে উপস্থিত।

ঠিক এই সময় স্রোতস্বিনী ও দীপ্তি অল্পদূরে দরজার সামনে পরস্পরের কটিবেষ্টন করে কী একটা রহস্য প্রসঙ্গে বারবার হেসে উঠছিলেন। ক্ষিতি এবং সমীরের মনে হল ব্যোমের উৎকট রঙের গলাবন্ধ এই হাস্যরসোচ্ছ্বাসের কারণ। কিন্তু ব্যোম জানান অন্যকথা। ব্যোমের মতে তাঁদের এই হাসির পিছনে কারণ-অনুসন্ধান অর্থহীন, কারণ তাঁর মনে হয় মেয়েরা অল্প কারণে যেমন কাঁদতে জানে, তেমনি অকারণে হাসতে জানে। কারণ ব্যতীত কাজ না হওয়ার নিয়মটা কেবল যেন পুরুষদের বেলাতে খাটে, মেয়েদের নয়।

সমীর জানান যে কেবল মেয়েদের হাসি নয়, হাস্যরসটিই তাঁর কাছে মনে হয় অসংগতিসূচক। দুঃখে কাঁদা আর সুখে হাসা সহজবোদ্য ব্যাপার, কিন্তু কৌতুকে আমরা হাসি কেন? কৌতুককে তো ঠিক সুখ বলা যায় না। মোটা মানুষ চৌকি ভেঙে পড়লে আমরা সুখ অনুভব করি না, অথচ হাসির কারণ হয়ে ওঠে—এ কথা পরীক্ষিত সত্য।

কৌতুকে হাসি কেন,-এই প্রশ্নটি যেমন জরুরি তেমনি এরপরের প্রশ্ন হল এই যে, সে কারণেই হোক হাসি

কেন?—এ-কথা জানালেন ক্ষিতি। অর্থাৎ হাসির কারণ নয়, হাসি ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চেয়েছেন তিনি। একটা কিছু ভালো লাগার বিষয় আমাদের সামনে উপস্থিত হলেই গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অদ্ভুত শব্দ, মুখের সমস্ত মাংসপেশি বিবৃত হয়ে বেরিয়ে পড়ে দাঁতের পাটি—এটিই হাসি। মানুষের মতো ভদ্রজীবের পক্ষে এটি এসংগত ব্যাপার এবং অবমাননাকরও। ইউরোপের সমাজে যেমন ভয়ের চিহ্ন, দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করে তেমনি প্রাচ্য সভ্যসমাজে আমরা কৌতুকের চিহ্ন প্রকাশ করাটিকে অসংযমের পরিচয় মনে করি।

সমীর ক্ষিতিকে সমর্থন করেই জানালেন ঃ কৌতুকে আমোদ অনুভব একদিকে অযৌক্তিক, অন্যদিকে ছেলেমানুষি। কৌতুকরসের সঙ্গে আমাদের সৌন্দর্যবোধ, বুদ্ধিবৃত্তির কোনও সম্পর্ক নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি জানিয়েছেন যে একটি গানের কথা। গানটিতে আছে : শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গের পর সকালবেলায় হুঁকা-হাতে রাধিকার রাধিকার কুটিরে আগুনের প্রার্থনাতে উপস্থিত হয়েছেন। হুঁকা-হাতে শ্রীকৃষ্ণের এই যে মূর্তি কল্পনা তা সুন্দর ও নয়, আনন্দজনকও নয়। সমীরের তাই মন্তব্য আমাদের হাসি ও আমোদের কারণ অদ্ভুত ও অমূলক। ক্ষিতি আবার সমীরকে সমর্থন করে জানান, সুখ এবং কৌতুকের মধ্যে শ্রেণিগত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির গৃহিণীপনাই এরকম—এক হাসির দ্বারা সুখ এবং কৌতুক দুটি কাজই সেরে ফেলা হয়।

ব্যোম অবশ্য ক্ষিতির সঙ্গে সহমত প্রদর্শন করেন না। বরং তিনি জানান যে সুখের হাসি আর কৌতুকের হাসির মধ্যে পার্থক্য আছে। সুখের হাসি স্মিতহাসি, আর কৌতুকের হাসি উচ্চ হাসি। কারণভেদে যেমন একই ইথারে আলোক ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, ঠিক সেরকম সুখহাস্য ও কৌতুকহাস্য একই উৎসজাত, কিন্তু কারণ ভেদে ভিন্ন। ইচ্ছা সঙ্গে অবস্থার অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। আবার ট্রাজেডিতেও ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। বলা যায় অসঙ্গতি দুই শ্রেণির—একটা হাস্যজনক, অন্যটা দুঃখজনক। অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখন কৌতুক বোধ হয়, আর গভীরতর স্তরে আঘাত করলে দুঃখ বোধ হয়। ভূতনাথবাবু শেষপর্যন্ত তাই জানান,—"স্থূল কথাটা এই যে, অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।"

২.৪.২ কৌতুক হাস্যের মাত্রা

কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে ডায়েরিতে লেখা আলোচনা পাঠ করে শ্রীমতী দীপ্তি ভূতনাথবাবুর কাছে একটি লেখা পাঠান। সেই লেখাটিকে আশ্রয় করে ভূতনাথবাবু নতুনভাবে কৌতুকহাস্য সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধটি সেই অভিমতের অনুলিপি।

দীপ্তি ভূতসভার পুরুষ-সদস্যদের হাস্যসম্বন্ধে সিদ্ধান্তকে বলতে চেয়েছেন যুক্তিহীন, অপ্রামণিক। ভূতনাথবাবু জানান, হাস্য সম্পর্কে তত্ত্ব নিষ্কাশনের পরিকল্পনা সেই আলোচনাতে ছিল না, এই আলোচনা ছিল মানসিক পায়চারি।

দীপ্তি প্রশ্ন তুলেছেন যে ভূতসভার চার সদস্যের সিদ্ধান্ত সত্য হলে চলতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেলে, কিংবা রাস্তায় যেতে যেতে অল্পমাত্রায় দুর্গন্ধ নামে এলে আমাদের হাসি পাওয়া, অন্তত উত্তেজনাজনিত সুখ অনুভূত হওয়া উচিত।

ভূতনাথবাবু এর উত্তরে জানান যে এই প্রশ্নের দ্বারা তাঁদের মীমাংসা খণ্ডিত হয়না, সীমাবদ্ধ হয় মাত্র। এই প্রশ্ন থেকে বোঝাযায় পীড়নমাত্রেই কৌতুকের উত্তেজনার জন্ম দেয় না; ফলে কৌতুক পীড়নের বিশেষ উপকরণটির উৎস সন্ধান করতে হয়।

জড় প্রকৃতির মধ্যে করুণরস বা হাস্যরস কিছুই নেই। বড়ো পাথর ছোটো পাথরে গুঁড়িয়ে ফেললেও আমাদের

চোখের জল আসে না, সমতলক্ষেত্রে হঠাৎ পাহাড় দেখতে পেলেও হাসি পায় না। জড় প্রকৃতির বাধা বিরক্তিজনক পীড়াজনক হতে পারে, কিন্তু কোনো স্থলেই কৌতুকজনক হয় না। সচেতন পদার্থের খাপছাড়া ব্যাপার ছাড়া শুষ্ক জড়পদার্থে আমাদের হাসির উদ্রেক করে না।

কৌতুক এবং কৌতূহলবৃত্তির মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক আছে। কৌতূহলের একটি প্রধান অঙ্গ নতুনত্বের লালসা, কৌতুকেরও প্রধান উপাদান নতুনত্ব। অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকত্বের মধ্যে যে বিশুদ্ধ অভিনবত্ব আছে, সঙ্গতি বা স্বাভাবিকত্বের মধ্যে তেমনি নেই। আবার প্রকৃত অসঙ্গতি মনের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত জড়পদার্থের মধ্যে তা নেই। পরিষ্কার পথে চলতে চলতে হঠাৎ দুর্গন্ধ নাকে এলে বুঝতে হবে নিশ্চয় কোথাও দুর্গন্ধ বস্তু আছে। জড়প্রকৃতিতে কোনো কার্য নিয়ম ব্যতিরেকে ঘটতে পারে না। কিন্তু পথ চলতে চলতে যদি দেখা যায় যে একজন মান্য বৃদ্ধ ব্যক্তি খেমটা-নৃত্য করছে, তবে সেটা প্রকৃতই অসঙ্গতির লক্ষণ, কারণ তা অনিবার্য নিয়ম সঙ্গত নয়। জড়ের ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামত কিছু ঘটে না, ফলে জড়ের পক্ষে কিছুই কৌতুকাবহ হতে পারে না। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তিটি ইচ্ছা করে নাচছে, ইচ্ছা করলে না নাচতে পারত। ফলে এই জন্যই তা অসঙ্গত, আর এই অসঙ্গতি কৌতুকাবহ।

কৌতূহল জিনিসটি যেমন অনেকক্ষেত্রে নিষ্ঠুর, তেমনি কৌতুকের মধ্যেও রয়েছে নিষ্ঠুরতা। এখানে উদাহরণস্বরূপ এসেছে সিরাজউদ্দৌল্লা প্রসঙ্গ। কথিত আছে যে সিরাজউদ্দৌল্লা দুইজনের দাড়িতে দাড়িতে বেঁধে নাকে নস্যি পুরে দিতেন এবং দুইজনেই যখন হাঁচতে আরম্ভ করতেন তখন সিরাজউদ্দৌল্লা আমোদ অনুভব করতেন। এখানেও ইচ্ছার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতি। যাদের নামে নস্যি দেওয়া হচ্ছে তাদের ইচ্ছা নয় যে তারা হাঁচে, কিন্তু তবুও তাদের হাঁচতেই হয়। এইরকম ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের অসঙ্গতি, কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতি, এগুলির মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে।

ব্যোম এইজন্য আগেই বলেছিলেন যে কমেডি এবং ট্রাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ মাত্র। ভূতনাথবাবু তাই বলেন যে কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশিত হয় তাতে আমরা হাসি, আর ট্রাজেডিতে তা সে মাত্রায় পৌঁছয় যাতে আমাদের চোখের জল আসে।

অসঙ্গতি কমেডি এবং ট্রাজেডি উভয়েরই বিষয়। কমেডিতে আমেদ এবং কৌতুককে সমীর সুখ বলতে নারাজ, বরং তাঁকে বলতে চান নিম্নমাত্রার দুঃখ। স্বল্প পরিমাণের দুঃখ ও পীড়ন আমাদের চেতনাতে যে আঘাত তৈরি করে তা একধরনের সুখের জন্ম দেয়। চড়ুইভাতিতে আমরা নিয়মভঙ্গ করে, বহু কষ্ট সহ্য করে, অসময়ে অনেক 'অখাদ্য' গ্রহণ করি; কিন্তু ভাই আমাদের কাছে আমোদ। আবার হুঁকা-হাতে রাধিকার কুটিরে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি আমাদের ধারণাকে আঘাত করে। এই আঘাত ঈষৎ পীড়াজনক, কিন্তু যেটুকু পীড়া দেয় তা কৌতুক সৃষ্টি করতে পারে।

ক্ষিতি জানান, কৌতুকে আমরা যে কেবল উচ্চহাস্য হাসি তা নয়, মৃদু হাসি, এমনকী মনে মনেও আমরা হাসি অনেক সময়। মূল কথাটি হল এই, কৌতুক হল মনে উত্তেজনার কারণ, আর মনের এই অনতিপ্রবল উত্তেজনা আমাদের কাছে সুখজনক।

ক্ষিতি, সমীর এবং ব্যোমের এই তর্ক-বিতর্কের শেষে ভূতনাথবাবু তাঁর অভিমত পেশ করেছেন। ভূতনাথবাবু জানালেন, মনের অনুভব ক্রিয়া মাত্রই সুখজনক, যদি না তার সঙ্গে 'কোনো গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি মিশ্রিত

থাকে।' ছেলেরা ভূতের গল্প শুনে যে হৃৎকম্পের উত্তেজনা অনুভব করে তাও আনন্দজনক। আবার রামায়ণে সীতাবিয়োগে রামের দুঃখ, লিয়রের মর্মযাতনা—আমাদের মনে বেদনা উদ্রেক করে। দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য থেকে বেশি সমাদর করি। কারণ দুঃখের অনুভব আমাদের চিত্তে বেশি আন্দোলন উপস্থিত করে।

ক্ষিতি ভূতনাথবাবুর মতামত থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—'আমরা বেশ বুঝিয়াছি যে, কমেডির হাস্য এবং ট্রাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে—'।

১.৬ প্রবন্ধ দুটির সাধারণ আলোচনা

'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা পরস্পরের পরিপূরক প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধটিতে যে আলোচনার সূত্রপাত দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে সেই আলোচনাটিরই বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটিতে অংশগ্রহণকারী সদস্য ছিলেন চারজন, আলোচনাটি ছিল কথোপকথন আশ্রয়ী। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি কথোপকথন-নির্ভর নয়, দ্বিতীয়টিতে ভূতনাথবাবু—যেন জবাবদিহি করছেন। এই জবাবদিহি শ্রীমতী দীপ্তির কাছে। আসলে কৌতুক হাস্য সম্পর্কে সার্বিক পরিচয় উপস্থাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় কৌশল অবলম্বন করেছেন।

একটি সাধারণ প্রসঙ্গ অবলম্বন করে আলোচনার গভীরে যাওয়ার যে পদ্ধতি তা 'কৌতুকহাস্য' প্রবন্ধটিতে বিদ্যমান। স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির হাসি লক্ষ করে একটি গূঢ় আলোচনাতে ঢুকে পড়েছেন চারজন সদস্য;—আমরা হাসি কেন?

লক্ষ করলে দেখা যাবে আলোচনাটির কয়েকটি স্তর আছে। উপস্থাপিত বিচ্ছিন্ন ভাবনাকে ক্রমানুসারে সাজালে বক্তব্যটি সহজেই ধরা পড়ে।

ভাবনাক্রম—১

দুঃখে কাঁদা, সুখে হাসা সহজবোধ্য ব্যাপার, কিন্তু কৌতুকে হাসার কারণ অজ্ঞাত। কৌতুক ঠিক সুখ নয়, হাস্যরসটিই অসঙ্গতিসূচক।

ভাবনাক্রম—২

কৌতুকে আমোদ অনুভব অযৌক্তিক এবং ছেলেমানুষি। কৌতুকরস আমাদের সৌন্দর্যবোধ, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত। অথচ প্রকৃতির গৃহিনীপনাই এরকম, এক হাসির দ্বারা সুখ এবং কৌতুকের কাজ সেরে ফেলা হয়।

ভাবনাক্রম—৩

সুখের হাসি এবং কৌতুকের হাসির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। স্মিতহাস্য সুখের হাসি, উচ্চহাসি কৌতুকের হাসি। একই উৎসজাত হলেও দুই হাসির প্রকৃতি ভিন্ন।

ভাবনাক্রম—৪

আমোদ এবং কৌতুক সুখ নয়, স্বল্পমাত্রার দুঃখ। মনের উপর স্বল্প পরিমান আঘাত ও পীড়া থেকেই কৌতুকরস সৃষ্টি হয়। চড়ুইভাতির নিয়মভঙ্গজনিত ক্লেশ আমোদের জন্ম দেয়, হুঁকা-হাতে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ধারণাকে যে সামান্য আঘাত করে তা কৌতুকের জন্ম দেয়।

ভাবনাক্রম—৫

গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি জড়িত না থাকলে অনুভবক্রিয়ামাত্রই সুখের। কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করে আমাদের সাধারণ অনুভবক্রিয়া জাগ্রত করে।

ভাবনাক্রম—৬

কমেডিতে রয়েছে অল্পপীড়া যা দেখে আমরা হাসি, ট্রাজেডিতে রয়েছে অধিক পীড়া যা দেখে আমরা কাঁদি।

'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধটিকে 'কৌতুকহাস্য' প্রবন্ধের পরিপূরক এ-কথা আমরা আগেই জানিয়েছি। প্রথম প্রবন্ধটির মধ্যে যে বিপরীত যুক্তিগুলো জাগ্রত হচ্ছিল সেগুলির উপযুক্ত জবাব রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছেন দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে। কমেডি ও ট্রাজেডি সম্পর্কে অভিমতে প্রথম প্রবন্ধটি শেষ হল, আর দ্বিতীয় প্রবন্ধটিও রবীন্দ্রনাথ শেষ করেছেন ট্রাজেডি-কমেডির কথাতে। আসলে প্রথম প্রবন্ধটিতে ট্রাজেডি-কমেডি সম্পর্কে অভিমতে সামান্য অগত্যা প্রয়োগ ছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে যেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন।

প্রথম প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে কৌতুকের উৎসে রয়েছে সামান্য পীড়ক। আর এই প্রবন্ধটিতে দীপ্তির লেখার মধ্য দিয়ে প্রশ্ন তুললেন, পীড়নমাত্রই কি কৌতুকের উত্তেজনার জন্ম দেয়? তাহলে, হঠাৎ হোঁচট খেলে, রাস্তার নাকে এলে হাসি পাওয়া উচিত ছিল।

এই সূত্রেই প্রাবন্ধিক আমাদের জানিয়ে দিলেন কৌতুকপীড়নের বিশেষ উপকরণটির উৎসসন্ধান না করে এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত আসা উচিত নয়। জড় প্রকৃতিজাত পীড়ন হাস্যরস তৈরি করতে পারে না। কেন না, জড় প্রকৃতিজাত পীড়ন হাস্যরস তৈরি করতে পারে না। কেন না, জড় প্রকৃতিতে কোনও কিছুই অকারণ ঘটতে পারে না। ফলে জড়প্রকৃতির বাধা পীড়াজনক হলেও কৌতুকজনক হতে পারে না।

কৌতুকের উৎসে আছে অসঙ্গতি। যা সঙ্গত, স্বাভাবিক তা কৌতুকের জন্ম দিতে পারে না। জড়জগৎকে যেহেতু নিয়মে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ফলে সেখানে অসঙ্গতিসূচক বলে কিছু থাকতে পারে না। ফলে অসঙ্গতি মনের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। অর্থাৎ এখানে আমরা বুঝতে পারলাম—প্রথমত পীড়মাত্রই কৌতূকের উত্তেজনা দিতে পারে না। জড়প্রকৃতিজাত পীড়ন কৌতুকের জোগানদার নয়। দ্বিতীয়ত এই পীড়ন যে কৌতূকের দিচ্ছে তার কারণ অসঙ্গতি, সেই অসঙ্গতি মনের ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কৌতুকহাস্য ব্যাপারটি একান্ত মনোজগৎজাত।

অসঙ্গতির সূত্র ধরেই অন্য একটি পর্যায়ে পৌঁছালেন প্রাবন্ধিক। এখানে অসঙ্গতি হল ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার অসঙ্গতি, কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের অসঙ্গতি, এগুলির মধ্যে আছে নিষ্ঠুরতা। ফলে বলা যায় কৌতুকের মধ্যেও রয়েছে নিষ্ঠুরতা।

আমরা সাধারণত ট্রাজেডির সঙ্গে দুঃখকে ও নিষ্ঠুরতাকে সংযুক্ত করে দেখি। কিন্তু কমেডিরও উৎসে আছে নিষ্ঠুরতা, আছে দুঃখ। রবীন্দ্রনাথ কৌতুকহাস্যকে বিশ্লেষণের নতুন মাত্রা করেছেন তারই অনুষঙ্গে। আলোচ্য প্রবন্ধদুটির মূল অভীপ্সাও সেটাই।

২.৫ 'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুক হাস্যের মাত্রা'র বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ

আলোচনাটির শুরুতে রবীন্দ্রনাথ একটি মুখবন্ধের অবতারণা করেছেন। কবির ভাষায় না বলে সহজ সরল এ কালের গদ্যে বলতে হয়, শীতের কুয়াশা ধীরে ধীরে কেটে সূর্য উঠছে, সূর্যের আতপ্ত রোদে ভোরবেলাটা ক্রমশই বেশি বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। সমীর চা খাচ্ছে, ক্ষিতি খবরের কাগজ পড়ছে, ব্যোম গলায় একটি নীল-সবুজের পশমি গলাবন্ধে গলাটা পাকে পাকে জড়িয়ে একটা বেখাপ্পা মোটা লাঠি নিয়ে মজলিশে এসে দাঁড়াল অন্যমনস্ক ভাবে। 'অন্যমনস্ক' হয়ে থাকাটা তার চিরচারিত স্বভাবের মধ্যেই পড়ে কেননা জগৎসংসার মিথ্যে এ ধরনের একটা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত প্রায়শই দুর্লক্ষ্য অসীম অনন্তলোকের ভাবনাচিন্তা নিয়ে থাকে। কিন্তু আজকের সকালে

তার সেই ধ্যাননিবিষ্টতা বেশিক্ষণ কার্যকরী থাকে না। কেননা মজলিসের অন্য দুই চরিত্র ঘনিষ্ঠ সখী বা আশ্রমিকদের মতো 'স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তি পরস্পরে কটিবেষ্টন করিয়া কী একটা রহস্য-প্রসঙ্গে বারম্বার হাসিয়া অস্থির হইতেছিল।' চরিত্রে ক্ষিতি ঘোরতর বস্তুবাদী, দৃশ্যমান জগতের কার্যকারণের পারস্পরিক যোগাযোগের তত্ত্বনির্ণয়ে সদাই সে ব্যস্ত থাকে। তার জীবনভর প্রয়াসই—কী করলে ক্রমশ আবশ্যকের সঞ্চয় এবং অনাবশ্যকের পতিহারের' মধ্যে দিয়ে জগৎ জীবনটাকে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়া যায়। সমীরও চরিত্র অনুযায়ী জাগতিক কার্যকারণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রয়াসী থাকে তবে তার এই জগৎ চর্চায় স্থূল ধরাতলই থাকে না, অধরা অন্তর্জগৎ ও খালাদিগন্তের খোলা বাতাসও অংশ নিতে থাকে। সুতরাং দুজনেরই কৌতূহল বাড়তে থাকে—সখীরা হাসে কেন? কার্যকারণটি কী? 'উৎকট নীল-হরিৎ পশমরাশি-পরিবৃত সুখাসীন নিশ্চিন্তচিত্ত ব্যোমই ঐ হাস্যরসোচ্ছ্বাসের মূল কারণ' বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায়। ব্যোমের সম্বিৎ ফিরে আসে। সে কিছুটা বুঝতেও পেরে যায় বন্ধুদের মনোভাবটি। সে তারই দূরীকরণে চরিত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা দিতে মনস্থ হয়ে ওঠে, 'পুরুষ-জাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনা কৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই কিন্তু মেয়েরা হাসে কী জন্যে তাহা দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। চকমকি পাথর স্বভাবত আলোকহীন, উপযুক্ত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইলে সে অট্টশব্দে জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে। আর মানিকের টুকরো আপনা আপনি আলোয় ঠিকরাইয়া পড়িতে থাকে। কোনো একটা সংগত উপলক্ষের অপেক্ষা রাখে না। মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে জানে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে ; কারণ ব্যতীত কার্য হয় না, জগতের এই কড়া নিয়মটা কেবল পুরুষেরই পক্ষেই খাটে।' সে স্পষ্টই জানিয়ে দেয় সখীদ্বয়ের হাসির এই উচ্ছ্রিক্ততার কারণ সে নয়।

আলোচনা মোড় নিতে পারত পুরুষ-নারীর প্রকৃতি ভিন্নতা নিয়ে। আলোচনায় বকলমে যদিও কোন একটি চরিত্রের নেপথ্যে প্রমথ চৌধুরী আছেন। যে-প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য। উনিশ শতকী য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনার মধ্যেই আমাদের বিদ্বজনের রসবেত্তারা যখন আবদ্ধ হয়ে ছিলেন, তখন প্রমথ চৌধুরীই বলতে পেরেছিলেন য়ুরোপ আর উনিশশতকে বসে-দাঁড়িয়ে নেই, সে ছুটছে বিংশশতকের সঙ্গে তালমিলিয়ে নতুন সংস্কার্যের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত নারীবাদী দর্শন তো দূরন্ত নারীজাগরণের আলোকটাও সেই ভাবে দিগন্তে রূপোলি রেখাঙ্কিত হয়ে ওঠেনি।

সুতরাং আলোচনা 'কৌতুকহাস্য' নিয়ে তত্ত্ব নিবিষ্ট হয়ে ওঠে।

সমীর নিজস্ব আলোচনা ছড়িয়ে চলে—— হাস্যরসটাই আমার কাছে কিছু অসংগত থেকে। দুঃখে কাঁদি মুখে হাসি এইটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু কৌতুকে হাসি কেন? কৌতুক তো ঠিক সুখ নয়।' প্রশ্ন উঠে আসে 'কৌতুক' নামক সঞ্চারণশীল আবেগটি কীভাবে উত্থিত হয়? কোন সংজ্ঞায় কি বাঁধা যায়? সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে, সমাজ ভেদে মান্যমানতার কী হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে? তৃতীয় প্রশ্নটাই মতামতের আলোড়ন অধিক আলোড়িত হয়ে চলে। কেননা একথাতো ঠিক 'আমাদের সমাজের প্রবীণরা কৌতুকরসকে 'ছ্যাবলামি বলেই ঘৃণা করিয়া থাকেন'। বিজ্ঞ-জ্ঞানীদের যথার্থ উপযুক্ত নয় 'ছেলেমানুষরাই উপযুক্ত' বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। কেননা আবেগকে রাখাই সুসভ্য বিজ্ঞ মানুষের পরিচিতি। তবুও সে-আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা মধ্যে মধ্যে ভয়ংকর কষ্টসাধ্যই হয়ে উঠে। যেভাবে সমাজ জীবনের চলিতঋতা এবং ব্যবহারিক জীবচর্যার মধ্যে দিয়ে অসংগতি-বৈপরীত্য অদ্ভুত-অমূলক অনেক কিছু উঠে আসে তাতে আমরা আলোড়িত হয়ে উঠি। এই-ধরণের আলোড়ন অস্বাভাবিক না হলেও আমাদের কাম্যতা 'অনর্থক সামান্য কারণ ক্ষণকালের জন্যে হলেও' বুদ্ধির এই পরাভব 'স্থৈর্য্যে এরূপ সম্যক বিচ্যুতি' থেকে যৎপরোনাস্তি দ্রুততায় আমরা যেন নিজ নিজ ভূমিকায় সুস্থ হয়ে উঠতে পারি। আমাদের শিষ্ট সমাজ আমাদের জীবনযাপনের এই প্রণালীই বেঁধে দিয়েছিল আমাদের জন্যে। আমাদের রক্তধারার মধ্যে আমাদের

সংসারের মধ্যে গড়ে দিয়েছিল এক যথাযোগ্যতা যথাপরিমিতিতা চিরাভ্যস্ততার নিয়মশৃঙ্খলা।

স্থানুসমাজে 'যথাযোগ্যতা যথাপরিমিতিতা চিরা ভ্যস্ততার নিয়মশৃঙ্খলা' অটুট থাকলেও জঙ্গামিত সমাজে মধ্যে মধ্যে অসংগতি বিসদৃশ পন্থায় উঠে আসে। যা আমাদের বুদ্ধির জগতে এক ধরনের পীড়নের-বোধ সৃষ্টি করে। কাম্য অবস্থার লঙ্ঘন ঘটায়, ফলে চেতনালোকে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তরঙ্গের গুণগত ও পরিমানগত প্রবণতার উপরই নির্ভর করে সুখ দুঃখ এবং কৌতুক বা আমোদ। তরঙ্গ যখন অনুভবের পারদে সুমিতির মাত্রা ছাড়ায় না তখন তা স্মিত হাস্যে মুখাবয়ব ও ওষ্ঠাধরে কিঞ্চিৎ লাবণ্যের সঞ্চালন ঘটায়, যাকে বলা যেতে পারে আনন্দ; যখন মাত্রা ছাড়িয়ে দ্রুত আঘাতের পীড়নেবেগে উদগীর্ণ হয়ে উঠতে থাকে তখন তা কৌতুক বা আমোদ রসে পরিপ্লুতি পায়। যখন সেই পীড়নবেগের উদগীর্ণতায় ভোক্তার গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি জড়িয়ে থাকে তখন তা থেকে এক দুঃখভার বা বেদনাকাতরতায় আবিষ্ট হয়ে যেতে হয়।

সূত্রাকারে বলতে গেলে বলতে হয়, মূলে থাকে জগৎ জীবনের চলিষ্ণুতা সম্পর্কে এক ধরনের সচেতনতায়। যা থেকে এক অনুভব-ক্রিয়ার জন্ম হয়। অনুভবের অনুরণন তিন পদ্ধতিতে পরিব্যাপ্তি পায়। (ক) সুমিত স্পন্দনে (খ) প্রবল থেকে প্রবলতর উদগীর্ণতায়— কিন্তু এই-বিপর্যস্ততায় যদি ভোক্তা বা সংশ্লিষ্টজন কোন ভাবে যুক্ত না থাকে তবে তার রূপ হয় এক ধরনের। (গ) যদি সেই-উদগীর্ণতায় ভোক্তা বা সংশ্লিষ্টজনের স্বার্থের যোগ থাকে নিবিড়ভাবে এবং গুরুতর দুঃখভয়ের আশংকায় মন-প্রাণ উদ্রিক্ত হয়ে উঠতে চায় তবে তার রূপ হয় অন্য ধরনের।

প্রাসঙ্গিক ভাবেই অতঃপর উঠে আসে 'ট্রাজেডি'র মৌল চারিত্রিক সূত্র। 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' আলোচনাটি কৌতুকহাস্যেরই প্রলম্বিত রচনা। কৌতুকহাস্যের বীজতলার অঙ্কুরিত কথাঙ্কুরগুলিকেই আর একটু অঙ্কুরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত ক্ল্যাসিক ধাঁচের প্রবন্ধ কখনই রচনা করে যাননি, সৃষ্টিশীল অন্য ধারার সাহিত্যের মতোই এক্ষেত্রেও সততই পরীক্ষানিরীক্ষা করে গেছেন। কেবলই ফর্ম ভেঙেছেন। তাঁর প্রবন্ধকে ঠিক কতটা বাজারচলিত সংজ্ঞাগুলিতে বাধা যাবে তা নিয়েও মীমাংসায় পৌঁছানো যাবে না। মূল প্রস্তাবনা থেকে মধ্যেমধ্যেই সরে গিয়ে অন্যপ্রসঙ্গের অবতারণা, কথকতার চল নিয়ে লোকায়ত জীবনের সূত্রভাবনা নিয়ে মেজাজমজ্জিতে কবি হয়ে ওঠা, আবার কখনও বা তারই মধ্যে সমাজবিজ্ঞানীর নিরীক্ষা নিয়ে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীগুলি নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে ওঠা। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধরচনার এ এক অনায়াস আচার হয়ে উঠেছিল। অথচ ইংরেজিতে যাকে বলে 'অ্যালেইগরি' রচনা তাও নৈব নৈব চ—— যেমনই স্থানে স্থানে গভীর গম্ভীর মন্ত্র ধ্বনিতে মন্ত্রিত তেমনই হাস্যোজ্জ্বল রসোজ্জ্বল স্ফটিক কঠিন তারল্যের সম্ভাবনা নিয়েও নিশানা-স্থির, নির্ভুলভাবেই লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে জানেন। নাই বা থাকল আর্নল্ড কথিত 'Pregision, Reason, Balance'.

প্রশ্ন উঠতেই পারে 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'য় প্রথম প্রবন্ধটিকে তো তিনি পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন। নতুন সংযোজন রূপে বলতে চেয়েছেন যে- অসংগতি বা প্রচলিত নিয়ম-রীতির গুরুতর ব্যত্যয় থেকে হাস্যরস উদ্রিক্ত হয়ে ওঠে, তা জড়প্রকৃতির ক্ষেত্রে খাটে না, খাটে সচেতন পদার্থের প্রতি। তাঁর উপমিত ভাষায়, "জড়প্রকৃতির মধ্যে করুণরসও নাই, হাস্যরসও নাই। একটা বড়ো পাথর ছোটো পাথরকে গুঁড়াইয়া ফেলিলেও আমাদের চোখে জল আসে না, এবং সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা খাপছাড়া গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাইলে তাহাতে আমাদের হাসি পায় না। নদী-নির্ঝর পর্বত-সমুদ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে আকস্মিক অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়—— তাহা বাধাজনক, বিরক্তিজনক, পীড়াজনক হইতে পারে, কিন্তু কোনো স্থানেই কৌতুকজনক হয় না। সচেতন পদার্থ সম্বন্ধীয় খাপছাড়া ব্যাপার ব্যতীত শুদ্ধ জড়পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না।" (কৌতুকহাস্যের মাত্রা ; পঞ্চভূত)

প্রাসঙ্গিকভাবে এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ জড় ও জীবনের মধ্যে একটি পার্থক্যকে সূচিত করে দেখিয়েছেন যা অসঙ্গতি, পীড়ন, নিয়মের ব্যত্যয় বা বৈপরীত্যে জীবনই উত্তেজিত হয়, পীড়িত হয়। কবির ভাষায় 'নীতি যেমন জড়ে নাই, অসংগতিও সেইরূপ জড়ে নাই। মনপদার্থ প্রবেশ করিয়া সেখানে দ্বিধা জন্মাইয়া দিয়াছে সেইখানেই উচিত এবং অনুচিত, সংগত এবং অদ্ভুত' এর জারক-রসে জারিত হয়ে আনন্দিত হয়। আহ্লাদিত হয়, দুঃখ কৌতুকের রসে নিজেকে প্রকাশ করতে দ্বিধান্বিত হয় না।

মানুষের মন চায় আবিষ্কার করতে, পরিচিত পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থেকে নতুনকে খুঁজে নিতে। নতুনের জন্যে কৌতূহল মানুষের বরাবর, কৌতূতহলের পূর্ণ নিবৃত্তিতেও সে এক রকমের কৌতুক বা আমোদ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কৌতূহলের একটা প্রধান অঙ্গ নূতনত্বের লালসা, কৌতুকেরও একটা প্রধান উপাদান নূতনত্ব। অসংগতের মধ্যে যেমন নিছক বিশুদ্ধ নূতনত্ব আছে, সংগতের মধ্যে তেমন নাই।" ব্যক্তিগত জীবনের চলন-ধারায়, সামাজিক জীবনের চলন-প্রক্রিয়ায় এই-অসংগতির নানান রূপ কেবলই উচ্ছ্রিত হয়। মন তাকেই আবিষ্কার করে নেয়। যাপিত জীবনের পথে অসংগতিজনিত এই আবিষ্করণ--ক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই মানুষ হাসে-কাঁদে আমোদিত-আহ্লাদিত হয়। একই কার্যকারণের সব ভিন্ন ভিন্ন স্তরে উদ্ভেদ। অসংগতি যখন অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখন আমাদের কৌতুক অনুভূত হয়, যখন গভীর স্তরের উদঘাটন ঘটায় তখন হৃদয় তাপিত হয়, গভীরতর দুঃখের কাতরতায় অন্তঃকরণ বিদ্ধ হয়ে ওঠে। ভেদ ঘটায় মাত্রায় বা স্তরে। "শিকারি যখন অনেকক্ষণ অনেক তাক করিয়া হংসভ্রমে একটা দূরস্থ শ্বেত পদার্থের প্রতি গুলিবর্ষণ করে এবং ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখে সেটা একটা ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে আমাদের হাসি পায়। কিন্তু কোনো লোক যাহাকে আপন জীবনের পরম পদার্থে মনে করিয়া একাগ্রচিত্তে একান্ত চেষ্টায় আজন্মকাল অনুসরণ করিয়াছে এবং অবশেষে সিদ্ধকাম হইয়া তাহাকে হাতে লইয়া দেখিয়াছে সে তুচ্ছ প্রবঞ্চনামাত্র, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়।"

অতঃপর অসংগতিজ্ঞাপক অনুভব-ক্রিয়ার লঘুত্ব ও গুরুত্বের তুল্যমূল্যতায় 'কমেডি' ও 'ট্রাজেডি'র ভেতরের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন "অসংগতি কমেডিরও বিষয়, অসংগতি ট্রাজেডিরও বিষয়। কমেডিতেও ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পায়। ফল্‌স্টাফ উইন্ড্‌সর-বাসিনী রঙ্গিনীর প্রেম-লালসায় বিশ্বস্তচিত্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দুর্গতির একশেষে লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন ; রামচন্দ্র যখন রাবণবধ করিয়া, বনবাস প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া, রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্যসুখের চরম শিখরে আরোহন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল—গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় স্থলেই আশার সহিত ফলের, ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অসংগতি দুই শ্রেণির আছে—একটা হাস্যজনক, আর-একটা দুঃখজনক। বিরক্তিজনক, বিস্ময়জনক, রোষজনককেও আমরা শেষ শ্রেণিতে ফেলিতেছি।"

শেষতক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আর দেরি হয় না সামাজিক ব্যবহারিক জীবনে যাকে আমরা চিহ্নিত করছি হাসি কান্না শোক তাপ আমোদ আনন্দ, সাহিত্যায়নের মধ্যে দিয়ে তার পরিচিত ঘটে 'কমেডি' তে। তা একই -তল থেকে উত্থিত হয়ে মাত্রাভেদের পরিবেশনায় এক এক নামে নামাঙ্কিত হয় মাত্র। মাত্রাভেদই মূল আধার।

কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিষয় থেকে বিষয়ান্তর যাওয়া আসা। তবে সেই-যাওয়া আসার অবশ্যই একটা সময়োপযোগিতা থাকে। যে কারণে এই রচনার শেষ হয় ভাবসর্বস্ব-আধ্যাত্মসর্বস্ব ভারতীয় জীবনধারার প্রতি একটা অম্লমধুর কটাক্ষ হেনেই 'দুর্ভিক্ষে যখন দলে দলে মানুষ মরিতেছে তখন সেটাকে প্রহসনের বিষয় বলিয়া কাহারো মনে হয় না। কিন্তু আমরা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি। একটা রসিক শয়তানের নিকট ইহা পরম কৌতুকাবহ দৃশ্য। সে তখন এই-সকল অমর আত্মা-ধারী জীর্ণ কলেবরগুলির প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া

বলিতে পারে, 'ঐ তো তোমাদের ষড়্দর্শন। তোমাদের কালিদাসের কাব্য, তোমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা পড়িয়া আছে, নাই শুধু দুই-মুষ্টি তুচ্ছ তণ্ডুলকণা, অমনি তোমাদের অমর আত্মা, তোমাদের জগদ্‌বিজ্ঞজয়ী মনুষ্যত্ব একেবারে কণ্ঠের কাছটিতে আসিয়া ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে। তবে কী কবিবচনের সেই ধ্রুবপদের তাৎপর্য 'অলি বার বার যায় অলি বার বার আসে' ধরে এই-রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যেতে পারে! তর্কাতর্কির কোন চরম বা পরম জবানি রচনার বদলে জ্ঞানতাত্ত্বিক চৌকাঠগুলিকে তিনি কেবলই ভাঙতে চেয়েছেন। নানান জ্ঞানদৃষ্টি এবং চিন্তন-মননের সমাহার নিয়ে মেলে ধরেন মানবিকীচর্চার বিশাল অঙ্গনে। জবানি ও পাল্টা-জবানির পরতগুলি খুলে খুলে জ্ঞানের অনুশীলনকে ক্রমশ করে তুলতে চান মুক্ত ও বিস্তৃত। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিংশশতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত আলোচনা ও প্রবন্ধ রচনার ত্রাসে আত্মসর্বস্ব দায়িত্বহীন যে গ্রন্থন-প্রক্রিয়া আমাদের চিন্তাচেতনার দিগন্তকে রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তারই বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছিলেন। তাই আলোচনার পরিসরে একই সঙ্গে স্থান করে নেয় বিপরীতমুখী জিজ্ঞাসা ; কাররই বলপূর্বক আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস কার্যকরী হয় না। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার মধ্যে দিয়ে তত্ত্বনির্ণয়ের প্রয়াস নিয়েও যেমন পরিহাস জোড়া হয় তেমনই 'নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ'কে প্রমাণসিদ্ধ করে তোলার বিতণ্ডাকেও সোপর্দ করা হয়। মানবপ্রকৃতির কূটস্থ নিয়েও বহুস্বরের সহাবস্থানকে স্থান দেওয়ার সচেতন প্রয়াসে কৃতসঙ্কল্প হয়ে উঠতে থাকেন। কেননা আলাপচারিতায় 'রক্তসঞ্চালন' দরকার। 'জ্ঞানসমুদ্রের খোলা হাওয়াকে' আমাদের 'কথোপকথন-সমাজে' অবাধে প্রবেশ করতে দেওয়ার সহিষ্ণুতাকে অভ্যাসসিদ্ধ করে তুলতেই এই রক্তসঞ্চালন। নাহলে আমরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারব না। সময়োপযোগী হয়ে উঠতে হলে এর বিকল্প আর কিছু হয় না।

ভাবলে কী খুব অন্যায় হবে বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে য়ুরোপের দেশে দেশে 'নিরন্তর বাক্‌কেন্দ্রিকতা'র বিরুদ্ধে যে লঘুগুরু আলোচনার সূচনা হয়েছিল বাংলাসাহিত্যে 'পঞ্চভূত'এর মধ্যে দিয়ে তারই বীজতলা রচনা করে চলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।